গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ২৫ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

কৃষক শহিদদের প্রতি
শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশজুড়ে

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইনের প্রতিবাদে লক্ষ লক্ষ কৃষক দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলে বিজেপি সরকারের পুলিশ তাঁদের উপর লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জলকামানের আক্রমণ নামিয়ে আনে। রাস্তা কেটে দিয়ে, কংক্রিটের ব্যারিকেড গড়ে তোলে। এই অবস্থায় কৃষকরা রাজধানীর একাধিক সীমান্তে অবস্থান শুরু করেন। প্রবল শীতের মধ্যে মহিলা শিশুরাও তাতে সামিল। ইতিমধ্যেই ৪০ জনের বেশি কৃষক একটানা অবস্থান করতে গিয়ে আন্দোলনের ময়দানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। একজন সন্ত ছাড়াও কয়েকজন আত্মাহুতি দিয়েছেন আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে। সংগ্রামরত কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ এআইকেএসসিসি-র ডাকে সাড়া দিয়ে এই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশজুড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করল এস ইউ সি আই (সি) এবং কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস সহ নানা গণসংগঠন।

দিল্লির আন্দোলনস্থলে শহিদ বেদিতে এআইকেকেএমএসের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ সহ নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। সমস্ত রাজ্যের রাজধানী এবং ব্লকে ব্লকে এই কর্মসূচি পালিত হয় এবং সর্বত্র শপথবাক্য পাঠ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় কয়েক হাজার স্থানে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আন্দোলনের শপথ নেন। কলকাতা শহরের শতাধিক স্থানে এই শপথ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের কর্মসূচি হয়।

আন্দোলনের শপথ

"কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তৈরি করা কর্পোরেট-স্বার্থবাহী, কৃষকবিরোধী তিনটি কৃষি-আইন ও বিদ্যুৎ আইন প্রতিরোধের লক্ষ্যে অদম্য দৃঢ়তায় এক অতুলনীয়, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে আমাদের দেশে। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ দিনের পর দিন দিল্লির রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে বসে রয়েছেন। হৃদয়ের গভীর থেকে আমরা আন্দোলনরত এই সাহসী বীরদের সংগ্রামী অভিবাদন জানাই। এই মহান সংগ্রামে বহু যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই বীর শহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করছি। এই সংগ্রাম সফল করতে আমরা কৃষক সমাজ ও মেহনতি মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান করছি।"

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
বিশ্বভারতীতে গ্রেপ্তার ডিএসও নেতারা

২০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশ্বভারতী সফর উপলক্ষে বিক্ষোভের উদ্যোগ নিয়েছিল এআইডিএসও। দেশের কৃষকসমাজ যখন বিপন্ন তখন তাদের সাথে দেশের সরকার চূড়ান্ত অমানবিক আচরণ করছে। এই পরিস্থিতিতে অমিত শাহের সফরের খবর আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ। তাঁরা বলেন, মন্ত্রীর এই সফর বিশ্বভারতীর গেরুয়াকরণের প্রক্রিয়াকেই ত্বরান্বিত করবে। সফরের বিরোধিতা করে এআইডিএসও বিশ্বভারতী কমিটির উদ্যোগে ব্যাপক দেওয়াল লিখন হয়, উপাচার্যকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা আগের দিন প্রতিবাদী মিছিল করেন। পোড়ানো হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুতুল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও বিক্ষোভ না হয় তার জন্য প্রশাসন এআইডিএসও-র বিশ্বভারতী ইউনিটের নেতা অমিত মণ্ডল, বিউটি সাহা সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বহু কর্মীকে সারাদিন গৃহবন্দি করে রাখে।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করার যে ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সারা দেশে ছাত্রসমাজ ও জনগণকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সংগ্রামরত কৃষকদের পাশে দাঁড়ান
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আহ্বান

এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, দিল্লির বুকে সংগ্রামরত কৃষকরা প্রতিদিন ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। এই প্রবল শীতের রাতেও খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক নারী-পুরুষ। সাথে রয়েছে তাদের শিশু সন্তানরাও। প্রতিদিন হাজারে হাজারে কৃষক যোগ দিচ্ছেন সেই অবস্থানে। ভেঙে গিয়েছে জাত-ধর্মের বেড়া। মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারের খোলা প্রাঙ্গণে রাস্তাতেই সারিবদ্ধ হয়ে বসে খাচ্ছেন সকলে। এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এমন কোন পন্থা নেই, যা গ্রহণ করেনি। সরকার নিজে রাস্তা কেটে দিয়েছে, বিশাল কংক্রিটের ব্যারিকেড তৈরি করেছে, নির্বিচারে লাঠি চালিয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, দিল্লির প্রবল ঠাণ্ডায় জলকামানের জলে ভিজিয়ে দিয়েছে কৃষকের শরীর। আবালবৃদ্ধ কৃষকরা বুক চিতিয়ে জল কামানের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'কত জল দেবে দাও। এর চেয়ে বেশি ঘাম তো আমরা মাঠেই ঝরাই।' রাষ্ট্রের এইসব দমন-পীড়নের আয়োজন কৃষকদের অদম্য প্রতিরোধের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ২২ জন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটেছে। এরকম মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা যে আরও ঘটতে পারে — তা কৃষকদের অজানা নয়। তবু আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তারা অটল। তাদের দাবি — সর্বনাশা কৃষি আইন-২০২০ ও বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী)-২০২০ বাতিল করতে হবে। আন্দোলনের চাপে বিজেপি সরকার কৌশল করে কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু কৃষকরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁরা দাবি

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষক-শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

২০ ডিসেম্বর দিল্লির সিংঘু সীমান্তে আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এআইকেকেএমএস নেতৃবৃন্দ

হরিয়ানায় গ্রেপ্তার এআইকেকেএমএস নেতারা

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার হরিয়ানা। পাঞ্জাবের সঙ্গে এই রাজ্য থেকেও হাজার হাজার কৃষকের স্রোত রাজধানীতে আছড়ে পড়ছে। ফলে দিল্লির সাথে হরিয়ানা জুড়ে সক্রিয় রয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বকারী সংগঠন এআইকেকেএমএস এই রাজ্যে কৃষকদের ক্রমাগত সংগঠিত করে আন্দোলনের প্রবাহ চালিয়ে যাচ্ছে। ধূর্ত বিজেপি সরকার তা আঁচ করে আন্দোলনের নেতাদের আটক করার ঘৃণ্য পথ নিয়েছে। রাজ্যের মহেন্দ্রগড় জেলার চাঁদপুরায় গ্রেপ্তার শুরু করেছে পুলিশ। ২০ ডিসেম্বর সংগঠনের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা কমরেড অমর সিং এবং কমরেড অভয় সিংকে গ্রেপ্তার করে এটেলি থানার পুলিশ। সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড বলবীর সিং যাদবকে গৃহবন্দি করে আন্দোলনকারী চাষিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারি কৃষকদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে। আওয়াজ উঠছে কতজনকে গ্রেপ্তার করবে করো। প্রয়োজনে সব কারাগার ভরবে। কিন্তু কৃষি নীতি বাতিল করতেই হবে। রাজ্যের বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান। তিন নেতার অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সংগ্রামরত কৃষকদের পাশে দাঁড়ান

একের পাতার পর

তুলেছেন — ‘সংশোধন নয়, বাতিল করো’। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিল্লির সিংঘু বর্ডারের ধরনা অঞ্চলের ৫টি এলাকার নামকরণ করেছেন বাবা বান্দা সিং, অজিত সিং, গুলাব কাউর, শহিদ-ঈ-আজম ভগৎ সিং ও শহিদ সাধু সিং তখত পুরার নামে। প্রেস গ্যালারির নামকরণ করা হয়েছে শহিদ আসফাকউল্লা খানের নামে। আন্দোলনকারীদের এই মর্যাদাবোধের দৃষ্টান্তে শুধু দিল্লি সীমান্ত নয়, গোটা দেশ এখন উত্তপ্ত, আলোড়িত, অনুপ্রাণিত।

নতুন এই কৃষি আইনের উদ্দেশ্য হল, খাদ্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে বহুজাতিক পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া। তারা জলের দরে কৃষকের ফসল কিনবে, আর অগ্নিমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে মুনাফা লুটবে। ফলে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়তে থাকবে, সাধারণ মানুষের জীবনও হবে দুর্বিষহ। দ্বিতীয়ত, ফসলের দাম পাওয়ার যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা দুর্বল হতে হতে এখনও আছে, তা তুলে দেওয়া হবে। তার দ্বারা কৃষক সমাজ আরও বেশি করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কৃপার পাত্র হবে। তৃতীয়ত, চুক্তি চাষ চালু করে কৃষকদের পরিণত করা হবে ক্রীতদাসে। এই আইন চালু হলে বাস্তবে রেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, মজুতদারি-ফাটকাবাজি ব্যাপক ভাবে বাড়বে। যার পরিণতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সর্বস্তরের ক্রেতারাও চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ‘বিদ্যুৎ বিল (সংশোধনী) ২০২০’র মধ্য দিয়ে কর্মী, সাধারণ গ্রাহক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ মুনাফা লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা হবে। তাই এই সংগ্রাম শুধু কৃষকের নয়, আপনার-আমার --- সকলের।

এই আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ও কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস পশ্চিমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যে কৃষকদের সংগঠিত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। দিল্লির আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এআইকেকেএমএস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এআইকেকেএমএসের সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকারী কৃষকদের সাথেই রাজপথে। বিভিন্ন ভাষায় প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সভা করে ‘কৃষক কমিটি’ গঠন করা হচ্ছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ‘গ্রামীণ ভারত বনধ’, ১৪ অক্টোবর ‘সারা ভারত কিষাণ প্রতিরোধ দিবস’ ও ৩ ডিসেম্বর ‘কৃষক সংহতি দিবস’ পালিত হয়েছে। জনস্বার্থবিরোধী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ভারত বনধের দিনে কৃষকরা যখন দিল্লি অভিযান শুরু করল, সেদিন আমাদের দল এবং কৃষক সংগঠনের কর্মীরা তাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে সক্রিয়ভাবে সেই ব্যারিকেডে অংশ নিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশ থেকে আমাদের ‘কিষাণ জাঠা’ দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করলে উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে তাদের খোলা আকাশের নিচে ৬৮ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। কিন্তু তাদের অদম্য সংগ্রামী মানসিকতার ফলে শেষ পর্যন্ত দিল্লি যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয় উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার।

কৃষক সংগঠনগুলির আহ্বানে গত ৮ ডিসেম্বরের দেশজোড়া ভারত বনধকে ভাঙতে কোনও চেষ্টাই বাদ রাখেনি বিজেপি সরকার। কোথাও জোর করে বাস চালিয়েছে, পুলিশবাহিনী নামিয়ে রুখে দিতে চেয়েছে মিছিলের জনজোয়ার। গুজরাট জুড়ে জারি করেছে ১৪৪ ধারা। পুলিশের দমন-পীড়ন দল ও কৃষক সংগঠনের উপর নেমে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের বদলাপুরে এস ইউ সি আই (সি)-র দলীয় দপ্তরে হামলা চালিয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, এআইকেকেএমএস-এর হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমরনাথকে গ্রেফতার করেছে, উত্তরপ্রদেশের কৃষক নেতাদের গৃহবন্দি করে রেখেছে, জৌনপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্যকে গ্রেপ্তার করেছে, ওড়িশার কটকে ৪৫ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীসহ ৫৫ জন বাম নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আন্দোলনের প্রতি প্রবল জনসমর্থন দেখে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সহ অন্যান্য রাজ্যের অবিজেপি সরকার দাবিগুলিকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেও ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু কোনও কিছুই সর্বাত্মক ধর্মঘটের স্বতঃস্ফূর্ততাকে আটকাতে পারেনি। এই সফল ধর্মঘট আন্দোলনে আরও গতি সঞ্চার করেছে।

শিক্ষক-অধ্যাপক-ডাক্তার-আইনজীবী-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সহ দেশ-বিদেশের নানা সংগঠন কৃষকদের এই আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়াবিদ, বিজ্ঞানী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারি পদক প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ফিরিয়ে দিতে শুরু করেছেন। এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, এআইইউটিইউসি সহ দেশের বিভিন্ন ছাত্র যুব মহিলা শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। অবস্থানরত কৃষকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দলের মেডিকেল ফ্রন্টের কর্মী সহ ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠন।

এই অভূতপূর্ব আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন জানিয়ে আমাদের দল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতে হবে এবং একে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি গ্রামে আন্দোলনের নিজস্ব হাতিয়ার হিসাবে ‘কৃষক কমিটি’ গড়ে তুলতে হবে, তৈরি করতে হবে ‘ভলান্টিয়ার বাহিনী’। তারই ভিত্তিতে আমরা পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলায় অসংখ্য ধরনামঞ্চ গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ব্লকে ব্লকে কৃষকদের ধরনা মঞ্চ চলেছে। আমরা মনে করি নির্বাচনের মাধ্যমে নয় বা নির্বাচনী স্বার্থে আন্দোলনের মহড়া নয়— বামপন্থী ও যথার্থ গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমেই গণআন্দোলনকে সঠিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং একমাত্র তার দ্বারাই জনসাধারণের বিজয় অর্জন সম্ভব।

নির্লজ্জ লুঠতরাজের অপর নাম ‘পিএম কেয়ার্স’

প্রধানমন্ত্রীর নামে তৈরি তহবিল। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি। অমিত শাহ সহ তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডে। সরকারি চাকুরেদের তহবিলে অনুদান দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রক। অথচ তা নাকি সরকারি তহবিলই নয়! সুতরাং তথ্যের অধিকার আইনে মানুষ তহবিল নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললে উত্তর মেলে না। কারণ, সরকারি নয় যে সংস্থা, তার ব্যাপারে সরকার উত্তর দেবে কেন! এমন মজার খেল-ই চলছে পিএম কেয়ার্স তহবিল ঘিরে।

বিপর্যয় সামাল দিতে ‘জাতীয় ত্রাণ তহবিল’ থাকা সত্ত্বেও করোনা অতিমারি মোকাবিলার নামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লকডাউনের মধ্যে যখন ‘পিএম কেয়ার্স’ তহবিল তৈরি করেন, তখনই এর পিছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠেছিল। সম্প্রতি আবারও এ নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল। প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত এই তহবিল নথিভুক্ত হয়েছে কেন্দ্রের রাজস্ব বিভাগে। অথচ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এর দলিলে বলা হয়েছে, পিএম কেয়ার্স কোনও সরকারি ট্রাস্ট নয়। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার— কেউই এর তহবিল বা দানের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কে নিয়ন্ত্রণ করে এই তহবিল?

এটি নাকি সরকারি ট্রাস্ট নয়। অথচ নথিভুক্ত হওয়ার পরদিনই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে— বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিতে যে টাকা দেয়, সেই ‘সিএসআর’ বা ‘কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি’-র টাকা নিতে পারবে পিএম কেয়ার্স। এদিকে কোম্পানি আইনে পরিষ্কার লেখা আছে, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল, ত্রাণ বা তফসিলি জাতি, জনজাতির উন্নয়ন তহবিল ইত্যাদির মতো কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তহবিলগুলিই কেবল সিএসআর-এর দান গ্রহণ করতে পারে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে সরকারি মন্ত্রক এমন বিজ্ঞপ্তি দিল? পিছনে কাদের নির্দেশ ছিল? উত্তর মেলেনি।

২৭ মার্চ ‘পিএম কেয়ার্স’ গঠনের পর ১৭ এপ্রিল অর্থমন্ত্রকের রাজস্ব দফতর কর্মচারীদের উদ্দেশে একটি সার্কুলার দেয়। তাতে বলা হয়, কর্মচারীরা ২০২১-এর মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসে একদিনের বেতন পিএম কেয়ার্স-এ দান করবেন। মজার ব্যাপার হল, এই দান কিন্তু কর্মচারীদের ইচ্ছাধীন নয়। সার্কুলারের ভাষা বলছে, কার্যত কর্মচারীদের বাধ্য করা হয়েছে ওই টাকা দিতে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনও অফিসার বা কর্মচারীর যদি এতে আপত্তি থাকে, তাহলে নিজের ‘এমপ্লয়ি কোড’ উল্লেখ করে তিনি যেন ২০ এপ্রিলের মধ্যে লিখিতভাবে রাজস্ব দফতরের ‘ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার’-কে সে কথা জানান। এ তো কর্মচারীদের ওপর রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করা! প্রশ্ন হল, কী কারণে এবং কাদের নির্দেশে সরকারি নয় এমন একটি তহবিলে টাকা দেওয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রক এ হেন উদ্যোগ নিল? কেনই বা একটি অ-সরকারি তহবিলের ভাণ্ডার ভরাতে সরকারি মন্ত্রকের এত মাথাব্যথা? তথ্যের অধিকার আইনে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেওয়ার দায় নেয়নি বিজেপি সরকার— কারণ পিএম কেয়ার্স সরকারি তহবিল নয়।

এবার দেখা যাক, কী পরিমাণ টাকা জমা পড়েছে এই তহবিলে। সংবাদসূত্রে জানা গেছে, তৈরি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে জমা পড়ে সাড়ে ছ’হাজার কোটি টাকা। এ বছরের ৩১মে পর্যন্ত জমা পড়া টাকার পরিমাণ ১০ হাজার কোটি। বড় অঙ্কের টাকা এসেছে কর্পোরেট পুঁজির মালিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থাগুলি ৩ এপ্রিল পর্যন্ত এই তহবিলে ঢেলেছে ৯২৫ কোটি টাকা এবং ওএনজিসি, আইওসি, ভারত পেট্রোলিয়ামের মতো সরকারি তেল কোম্পানিগুলি দান করেছে ১০০০ কোটি টাকা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এতদিনে অনুদানের পরিমাণ আরও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নামে তহবিল। অথচ বন্যার স্রোতের মতো তহবিলে ঢোকা বিপুল টাকার হিসাব-নিকাশের কোনও দায় কিন্তু মোদীজি বা তাঁর সরকারের নেই। পিএম কেয়ার্সের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই সরকারি সংস্থা সিএজি-র। কারণটা খুব সোজা। এটি সরকারি তহবিলই নয়। তার মানে, কোথা থেকে আসছে এই বিপুল টাকা, কারা কী উদ্দেশ্যে ও কোন শর্তে এই টাকা দিচ্ছে, কোথায়, কোন খাতে এবং কী পদ্ধতিতে তা খরচ হচ্ছে বা হবে— এই সব অত্যন্ত জরুরি প্রশ্নের কোনওটিরই উত্তর দিতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। তার মানে, অতিমারি বিপর্যয় মোকাবিলার নামে তোলা এই বিপুল টাকা ইচ্ছামতো, এমনকী নিজস্ব দলীয় স্বার্থ পূরণে ইচ্ছামতো ছড়ানোয় কোনও বাধা নেই মোদিজীর ও অমিত শাহ সহ তাঁর সঙ্গীসাথীদের।

তবে কি করোনা অতিমারিজনিত বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়ে এবং সরকারি পদমর্যাদা ব্যবহার করে এভাবে বিপুল লুঠতরাজের ব্যবস্থা করলেন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহরা! এ প্রশ্নের উত্তর তাঁদেরই দিতে হবে। দেশের মানুষের সঙ্গে এ যদি চূড়ান্ত প্রতারণা না হয়, তাহলে এ আর কী! তবে কি ধরে নিতে হবে, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গীরা এই ‘দিনে ডাকাতি’কে অধিকার বলে মনে করেন? নৈতিকতা দূরে থাক, চক্ষুলজ্জাটুকুও কি তবে বিসর্জন দিয়েছেন বিজেপি সরকারের বড়কর্তারা!

মানুষ আজ প্রশ্ন তুলছে, তাদেরই ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকারে বসে তাদেরই কষ্টার্জিত টাকা ইচ্ছামতো লুট করার এই সাহস বিজেপি নেতারা পেলেন কোথা থেকে! তাঁরা কি ভাবছেন দেশের মানুষ এ জিনিস চুপচাপ মেনে নেবে? আজ হোক, কাল হোক এর হিসেব তারা বুঝে নেবেই।

কৃষি-আইন যদি চাষির স্বার্থে, তবে কর্পোরেটরা উল্লসিত কেন!

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষকরা প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে প্রায় এক মাস ধরে অভূতপূর্ব দৃঢ়তায় নজিরবিহীন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কৃষি আইনের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার। তাঁরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন কৃষকের জীবনে সর্বনাশ আনবে এই আইন। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী এই আইনের সমর্থনে বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নই এই আইনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন মানেই কি কৃষকের উন্নয়ন? প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে যে উন্নয়নের কথা বলছেন, তাতে কৃষকরা আতঙ্কিত এবং বড় বড় পুঁজিপতিরা আনন্দিত হচ্ছে কেন? এই আইন তা হলে কাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আনল সরকার? এই প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর প্রধানমন্ত্রী থেকে কৃষিমন্ত্রী সকলেই এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আইনে উৎফুল্ল আম্বানি-আদানিরা

কৃষকরা বলছেন, এই আইন শুধু আম্বানি আদানিদের মতো খাদ্যপণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের জীবনেই উন্নয়ন নিয়ে আসবে। এই কথা কি শুধু কৃষকরাই বলছেন? না। এ দেশের শিল্পপতি-পুঁজিপতিরাও সে কথা বলছেন। তাঁদের সংগঠনগুলি এই আইনের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছে সরকারকে। যেমন বণিকসভা সিআইআই-এর কথাই ধরা যাক। শিল্পপতিদের এই সংগঠনের সদস্য বিভিন্ন সংস্থার মুখ্য আধিকারিকরা (সিইও) এক যৌথ বিবৃতিতে এই আইনকে সমর্থন করেছেন। আদানি গোষ্ঠী বিজ্ঞাপন দিয়ে কৃষি আইনের গুণাগুণ ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছে। অবশ্য এঁরা তো কখনও বলেন না যে, এই আইন সরকার তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই নিয়ে এসেছে। বরং সরকারের মন্ত্রীদের মতো এঁরাও সব সময় বলেন, এর ফলে দেশের কৃষকদেরই মঙ্গল হবে। যেমন তাঁরা বলেছেন, এই আইনের ফলে দেশে কৃষি বাজারের পরিধি বাড়বে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ বাড়বে। এরই পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়বে এবং উন্নত মানের আধুনিক কৃষি পরিকাঠামো তৈরি হবে।

নতুন আইন কার্যকর হলে কৃষি বাজারের পরিধি বাড়বে এ কথা সত্যি। এ কথাও সত্যি যে বিনিয়োগ বাড়বে এবং উন্নত মানের আধুনিক কৃষি পরিকাঠামো তৈরি হবে। কিন্তু এই বিনিয়োগ করবে

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ১৪-১৫ ডিসেম্বর কোচবিহারে ধরনা। বক্তব্য রাখেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক কমরেড দেবেন বর্মন ও দলের জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার।

কে? কৃষক? দেশের ৮৬ শতাংশ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। তারা নিশ্চয় এই বিনিয়োগ করবে না। তবে কি সরকার বিনিয়োগ করবে? একেবারেই না। বরং ঠিক উল্টোটা। সরকার কৃষিতে এতদিন যতটুকু খরচ করত, এই আইন চালু করার মধ্য দিয়ে সেটুকুও এখন বন্ধ করে দেবে। তা হলে আর রইল দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। তারাই কৃষিতে বিনিয়োগ করবে। আধুনিক কৃষি পরিকাঠামোও তারাই তৈরি করবে। কারণ অতি ব্যয়বহুল এই পরিকাঠামো কোনও কৃষকের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই পরিকাঠামোর মানে কী? মানে বিরাট আয়তনের গোডাউন এবং হিমঘর, খাদ্য-পরীক্ষাকেন্দ্র, ঝাড়াই-বাছাইয়ের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, গুণমান নির্ণয়, প্যাকিংয়ের সুবিধা, স্টিম তৈরি এবং ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা, ফল প্রভৃতি পাকানোর ব্যবস্থা এবং নানা ধরনের প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা। বুঝতে অসুবিধা হয় না, যদি সরকার না করে তবে এ সব করা একমাত্র বড় বড় পুঁজিপতিদের পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য সরকার কৃষকদের জন্য এই সব ব্যবস্থা গড়ে না তুললেও আম্বানি-আদানিদের সহায়তার জন্য দরাজ হাতে এগিয়ে এসেছে। এগ্রি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড গঠন করে তাতে ১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে সরকার, যা এই সব পুঁজিপতিদের ভরতুকি এবং নামমাত্র সুদে ঋণ হিসাবে তুলে দেওয়া হবে। অর্থাৎ কৃষি পরিকাঠামো যা গড়ে উঠবে তাতে কৃষকের থেকে ফসল কম দামে কিনে নিয়ে ইচ্ছামতো মজুত করা এবং প্রক্রিয়াকরণ করার কাজে লাগাবে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। কৃষক তার কোনও সুবিধা পাবে না। কৃষকদের দীর্ঘ দিনের যে দাবি— সার, বীজ, কৃষি উপকরণ, সেচের জল, বিদ্যুৎ বা ডিজেল এই সমস্ত কিছু সস্তায় দিক সরকার। কৃষি মজুরদের মজুরির কিছুটা দায় সরকার নিক। তা হলেই কৃষি লাভজনক হবে। এ ছাড়াও কৃষকদের দাবি চাষে উৎপন্ন ফসল সরাসরি সরকারকেই কিনতে হবে। কিন্তু সরকার এ জন্য কোনও বরাদ্দ করল না। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিক্ষেত্রের এই সংস্কারে একচেটিয়া মালিকরা উল্লসিত হয়ে একে যুগান্তকারী বলছে।

কর্পোরেটরা পুঁজি খাটায় কৃষকদের প্রতি দরদ থেকে নয়

সরকারের অনুগ্রহভাজন অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ নামধারীরা প্রচার করছেন, কর্পোরেটরা বাজারে ঢুকলেই কৃষক ও ভোক্তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, এ যুক্তি নাকি ঠিক নয়। দেশে পণ্যের বাজারগুলো কর্পোরেটরা চালালেও তাতে নাকি সাধারণ মানুষের বড় ক্ষতির প্রমাণ নেই। এই সব ঠাণ্ডাঘরের বিশেষজ্ঞরা বাস্তবে সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে পুরোপুরিই অজ্ঞ। না হলে কর্পোরেটদের হাতে সাধারণ মানুষের সর্বনাশটা তাঁদের চোখ এড়াত না। যে সব পণ্যের বাজার কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে তার একটা কোনও ক্ষেত্র কেউ বলতে পারবে যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি? এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ টেলিকমিউনিকেশনের উদাহরণ টানেন। রিলায়েন্সের জিও যে বাজার দখলের জন্যই এক সময়ে ফোনের খরচ কমিয়েছিল, এ কথা যিনি না বোঝেন তিনি কেমন বিশেষজ্ঞ, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নতি, কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বাজারের পরিধি বাড়লে কৃষকদের লাভ কী? এই উন্নত পরিকাঠামোর সুযোগ যেমন কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা নেবে তেমনই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারও তারাই করবে, কৃষকরা নয়। খুব বেশি হলে এই সব বড় ব্যবসায়ীদের সাথে কৃষকদের চুক্তি চাষে তা ব্যবহার হবে, যে ফসলের মালিক কৃষক হবে না, হবে চুক্তি করা ব্যবসায়ী। তাই সিআইআই-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং সাবকমিটির চেয়ারম্যান তথা আইএফবি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের এমডি ও ভাইস-চেয়ারম্যান এ কে ব্যানার্জী এই আইনকে প্রগতিশীল এবং দেশে কৃষি বাজারের বিকাশে সহায়ক বলে প্রশংসা করে বলেছেন, 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান প্যাকেজের আওতায় কৃষি সংস্কারের পদক্ষেপগুলি ঘোষিত হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির জন্যই কৃষি আইন সংসদে পাশ হয়েছে।' অর্থাৎ সরকার নতুন কৃষি আইন নিয়ে কৃষকদের কিংবা তাদের সংগঠনগুলির সাথে কোনও আলোচনা না করলেও এই সব বণিকসভাগুলির সাথে আলোচনা করার পরেই তা এনেছে। এর পরেও কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে, এই আইন সব দিক থেকেই কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থবাহী, কৃষকদের নয়?

কৃষির এই 'উন্নয়ন' আসবে কৃষকদের লাশের উপর দিয়ে

আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই দেশের কৃষি বাজারটিকে দখল করার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে আম্বানির ই-কমার্সের ব্যবসা জিও-মার্ট। কোভিড অতিমারির চলার সময়েই রিলায়েন্স কোম্পানি ঘোষণা করে, তারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খুচরো ব্যবসা চালানোর কোম্পানি 'ফিউচার গ্রুপ' ৩৫০ কোটি ডলারে কিনে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অতিমারির সময়েই আমেরিকার দৈত্যাকার কোম্পানি 'ফেসবুক'-এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছে রিলায়েন্সের। রিলায়েন্স জিও প্ল্যাটফর্মে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে ফেসবুক। রিলায়েন্স-ফেসবুক জানিয়ে দিয়েছে রিটেল ব্যবসায় দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায়

১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় কৃষক ধরনা। সভাপতিত্ব করেন এআইকেকেএমএসের জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড অরবিন্দ সাহা। বক্তব্য রাখেন মোজাম্মেল হক, উৎপল দত্ত, আইনজীবী অশোক দাঁ, সামসুল আহম্মদ, সন্তু মণ্ডল প্রমুখ।

পৌঁছে যাবে তাদের পণ্য, আর দেশের প্রতিটি কোণা থেকে ফসল তুলে নিয়ে আসবে তারা তাদের গুদামে। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই সংস্থার সম্মিলিত বিপুলাকার পুঁজির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন সাধ্য ভারতের বাজারে আর কারও নেই। একই ভাবে আদানিরা যেমন ইতিমধ্যেই বিশাল বিশাল গুদাম আর হিমঘর বানিয়ে ফেলেছে তেমনই কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা খুলে বসে আছে। সেই কারণেই সারা দেশের সাধারণ মানুষের দাবি মেনে আইন প্রত্যাহারে নারাজ সরকার। ফলে কৃষির এই তথাকথিত উন্নয়ন যে আসবে দেশের কোটি কোটি কৃষকের মৃতদেহের উপর দিয়ে, তা বুঝতে অসুবিধা নেই। এর ফলে শুধু কৃষকরাই নয়, খুচরো ব্যবসায়ীরাও বিপদে পড়বেন।

সরকার-কর্পোরেটের অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে

আম্বানি-আদানি সহ একচেটিয়া পুঁজি গোষ্ঠীর সাথে বিজেপির সখ্যতা এখন প্রকাশ্যেই। তাদের ইচ্ছায় এবং টাকার জোরে বলীয়ান হয়েই যেমন বিজেপি ক্ষমতায় বসেছে, তেমনই সেই ঋণ শোধ করতে একদিকে প্রায় সমস্ত জাতীয় সম্পদই এদের হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। তার জন্য সব রকমের আইনকে তারা বদলে দিচ্ছে। তারই ফল যেমন কৃষি আইনে পরিবর্তন তেমনই শিল্প আইনকেও পুরোপুরি বদলে ফেলা। শিল্পপতি এবং সরকারের এই দুষ্টচক্র ভারতের ইতিহাসে পূর্বেকার সব নজির ছাপিয়ে গেছে। এই কৃষি আইনের সাথে কৃষক স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই শুধু নয়, কৃষকদের স্বার্থকে পুঁজিপতিদের পায়ে বিসর্জন দিয়েই তা আনা হয়েছে। যদিও এই সত্য ধরতে কৃষকদের কোনও অসুবিধা হয়নি। তাই বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আন্দোলনে কৃষকরা তাঁদের দাবিতে অনড়।

সরকার এবং একচেটিয়া পুঁজির এই শক্তিশালী চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই কৃষকদের আন্দোলন। শ্রমিক কর্মচারী খুচরো ব্যবসায়ী সহ সব অংশের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে এসে আজ এই আন্দোলনকে শক্তি জোগাতে হবে। তা না হলে পুঁজির সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে কেউই রেহাই পাবে না।

তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার এক মাসে দু'বার রান্নার গ্যাসের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে। এর প্রতিবাদে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)। ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুলে আগুন দিয়ে ও সভা করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কলকাতায় রাজভবনের গেটে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই দামবৃদ্ধির নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)।

কোচবিহার

রাজভবন, কলকাতা

মেদিনীপুর শহর

রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ, ২১ ডিসেম্বর

পেট্রোল-ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আসামের গুয়াহাটিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। ১৬ ডিসেম্বর

বামনহাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ভাড়া বাড়ল ৬৫০ শতাংশ

রেলে ৬৫০ শতাংশ ভাড়া বেড়েছে! চমকে উঠবেন না। তাজ্জব এই কাণ্ডটি ঘটেছে কোচবিহারের বামনহাট-শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। ট্রেনটিকে 'স্পেশাল' নাম দিয়ে ভাড়া ১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা করা হয়েছে।

হবে না-ই বা কেন! দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি যা খুশি তাই করতে পারেন, তাহলে তার রেল মন্ত্রক পারবে না কেন! ফলে, ভাড়া না বাড়ালে চলে কি না, বা বাড়ালে জনগণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে ন্যূনতম কতটুকু বাড়ানো যেতে পারে, এইসব তুচ্ছ ভাবনার অবকাশ নেই নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সরকারের কর্তাদের কাছে। ফলে ১০ টাকার ভাড়া আচমকা ৭৫ টাকা ধার্য হয়ে গেল।

কিন্তু জনগণ প্রশ্ন তুলেছে, বামনহাট থেকে দিনহাটা, যেখানে বাসভাড়া ২০ টাকার মতো, সেখানে ট্রেনভাড়া ৭৫ টাকা হবে কেন? কেন এই জুলুমবাজি?

এই ট্রেনে যে স্টেশনেই যান না কেন ভাড়া ৭৫ টাকা। অর্থাৎ উঠলেই ৭৫ টাকা। এর যুক্তি কী? শুধু এই ট্রেনেরই ভাড়া বাড়েনি, সমস্ত ট্রেনেই ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেসে ভাড়া ১২৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। করোনার জন্য কি সরকারের পকেটে টান পড়েছে? তাই যদি হয় তাহলে করোনায় তো জনগণেরও পকেটে টান পড়েছে! তারা দেবে কেথেকে? 'স্পেশাল' নাম দিয়ে এই ট্রেনের জেনারেল সিট তুলে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। ১৮ ডিসেম্বর কোচবিহার স্টেশনে বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই(সি)। তাদের দাবি পূর্বের ভাড়া ফিরিয়ে আনতে হবে। স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে রেলমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই গলাকাটা ভাড়া প্রত্যাহার না করা হলে আন্দোলন তীব্রতর হবে।

থানায় বিক্ষোভ রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির

মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানার ছয়ঘরি হাজামপাড়া গ্রামের সঞ্জিলা খাতুনকে ১০ ডিসেম্বর মাঝরাতে দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করে। পিতৃহীন, অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে ইসলামপুর কলেজের ছাত্রী সঞ্জিলা ও তার ভাইবোনেরা অন্যদের সহযোগিতায় পড়াশুনা করত।

এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে মহিলারা ১৩ ডিসেম্বর দৌলতাবাদ থানার অফিসার ইনচার্জকে ডেপুটেশন দেন। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে অফিসার ইনচার্জ আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করেন।

পরে মৃতার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন সমিতির সম্পাদক খাদিজা বানু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমাজের সর্বত্র যেভাবে মহিলাদের নিরাপত্তা আক্রান্ত হচ্ছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা। শিক্ষক আকবর আলী, আবুল কালাম, আমিনা খাতুন সহ সমিতির নির্যাতিতা নারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়ায় অ্যাবেকার বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকাও কর্পোরেটপন্থী কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হল। ১৬ ডিসেম্বর বাঁকুড়া শহরে প্রধান বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি নয়া বিদ্যুৎ আইন বাতিল করতে হবে, সর্বনাশা কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। নেতৃবৃন্দ দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। গ্রাহকদের মিছিল শহর পরিক্রমা করে রাস্তা অবরোধ করে। বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দেন জেলা সভাপতি অমিয় গোস্বামী, সম্পাদক স্বপন নাগ, তারাপদ গরাই, গোবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণপদ বিশ্বাস, বীরেন মণ্ডল, হরিদাস ব্যানার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ বিল সংশোধন, মিটার, ট্রান্সফরমার সরবরাহের দাবি কার্যকর করার আশ্বাস দিয়েছেন।

গ্রুপ ডি পদে স্থায়ী নিয়োগের দাবি

২০১৬ সালে রাজ্যের তৃণমূল সরকার ঘোষণা করেছিল ৬০ হাজার গ্রুপ-ডি পদে স্থায়ী নিয়োগ হবে। সেই পরীক্ষার. নোটিফিকেশন বেরোনোর পর ১৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে মাত্র ১৯ হাজার জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এবং ৫ হাজারের মতো নিয়োগ করা হয়। সরকার বলেছিল প্রাথমিকভাবে সাড়ে ৬ হাজার জনকে নিয়োগ করা হবে। বাকি পদের জন্য সহস্রাধিক যুবককে ওয়েটিং লিস্টে রাখা হয় এবং তাদের বলা হয় পরে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু চার বছর পার হয়ে গেলেও সেই ওয়েটিং লিস্টের ক্যান্ডিডেটদের নিয়োগ হলো না। দুর্নীতিমুক্ত ভাবে এই নিয়োগের দাবিতে গ্রুপ-ডির ওয়েটিং লিস্টের ক্যান্ডিডেটরা ১৪ ডিসেম্বর নবান্ন অভিযান করেন। মহামিছিলের ডাক দেন।

এই মিছিলে এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত সিকদার এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সুপ্রিয় ভট্টাচার্য।

দিল্লিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের মেডিকেল ক্যাম্প

দিল্লিতে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, সমর্থক এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ১৬ ডিসেম্বর সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের (এসডিএফ) এক দল চিকিৎসক দিল্লিতে পৌঁছেছেন। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ স্বপন বিশ্বাসের নেতৃত্বে সহকারী সম্পাদক ডাঃ কল্যাণব্রত ঘোষ সহ অন্যান্যরা রয়েছেন এই মহতী কাজে। এই আন্দোলন যত দিন চলবে এসডিএফ মেডিকেল ক্যাম্প চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রবল শৈত্যপ্রবাহের ফলে আন্দোলনরত মানুষ শয়ে শয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাদের পরিচালিত ক্যাম্পে প্রতিদিন প্রায় ৩৫০ জনকে (বেসক্যাম্প ও মোবাইল টিম মিলিয়ে) চিকিৎসা সহ বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও সুগার টেস্ট করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২ ডিসেম্বর থেকে ডাঃ অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার চিকিৎসা শিবির চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম বর্ধমান ডিএম দপ্তরে যুবশ্রী বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১৪ ডিসেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ২০১৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী যুবশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত সমস্ত বেকার যুবকদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কাজ জোটেনি। প্রকল্পের অন্তর্গত এক লক্ষ বেকারের চাকরি এবং চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতার দাবিতে ছিল এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সমিতির জেলা আহ্বায়ক বিদ্যুৎ মুখার্জি।

খাল সংস্কার ও সেচের জলের দাবিতে বিডিও ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ব্লকের পায়রাটুঙ্গি খাল ও নাসা খালগুলি সংস্কার এবং বোরো চাষের জলের দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর তমলুক বিডিও অফিসে মিছিল করে ডেপুটেশন দিল কৃষক সংগ্রাম কমিটি। দীর্ঘ দিন ধরে ব্লকের মূল জলনিকাশি এই খালটি ও এলাকার নাসাখালগুলি সংস্কার না হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমে যাচ্ছে। ধান ও পান চাষিরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমন ধান পচছে, অন্যদিকে বোরো চাষ করার উপায় নেই। মাঠে জল জমে আছে। ওই দিন শতাধিক চাষি স্মারকলিপি দেন বিডিওকে। নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক শশাঙ্ক আদক, সভাপতি সুদর্শন সামন্ত, শিক্ষক শম্ভু মান্না, নরেন্দ্রনাথ মাইতি, একাদশী দাস,অভিজিৎ মাইতি প্রমুখ। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেন।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যে রাজ্যে ধরনা মঞ্চ

বাঙ্গালোর ঃ কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে মৌর্য সার্কেলে অনুষ্ঠিত হল কৃষক ধরনা মঞ্চ। রাইথা কৃষি কর্মীকারা সংগঠন (আর কে এস)-এর উদ্যোগে এই ধরনার চতুর্থ দিনে বক্তব্য রাখেন সমাজকর্মী পিএ মালেশ, এস আর হিরেমাত এবং সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এইচ ভি দিবাকর। মোদি সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী এবং বিস্তৃত করার আহ্বান জানান তারা।

আগরতলা, ত্রিপুরা

छत্তিশগড়

বাঙ্গালোর, কর্ণাটক

আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ

৭৫ লক্ষ চাকরি! ভোটের পরে কেন, এখনই দিতে অসুবিধা কোথায়

৭৫ লক্ষ চাকরি হাতের মুঠোয় নিয়ে বসে আছেন বিজেপি নেতারা, শুধু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার অপেক্ষা! তাঁরা এমনকি বেকারদের কাছে চাকরির কার্ড বিলি করতে শুরু করেছেন। ভোট মিটে গেলেই কার্ড দেখে দেখে তাঁরা লাইন দিয়ে চাকরি দেবেন। এমন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন অধুনা বিজেপি নেতা ও সাংসদ তথা এক সময় তৃণমূলের একসময়ের দাপুটে দুই নেতা, যৌথভাবে।

কিন্তু চাকরিই যদি দেবেন, ভোটের পরে কেন? এখনই শুরু করলে হয় না? বিজেপি তো কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে। সারা দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ২৪ লক্ষের বেশি পদ খালি পড়ে আছে সেগুলিতে নিয়োগ শুরু করলেই তো পশ্চিমবঙ্গের ভাগে অন্তত কয়েক লক্ষ পড়ত! এই কাজটা তাঁরা শুরু করলেন না কেন? বরং উল্টো পথে হেঁটে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৫ বছর ধরে খালি থাকা পদগুলি বিলোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালে ৩৩ শতাংশ ডাক্তার, ৪৫ শতাংশ নার্স, বিহারের ৫৯ শতাংশ ডাক্তারের পদ খালি পড়ে আছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২৭-১০-২০)। বিজেপি সরকার কি তাহলে চাকরি দেওয়ার লোক পায়নি? যদি তাই হয়, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের সদ্য পাশ করা ডাক্তার নার্সদের নিয়ে গিয়ে চাকরি দেওয়া শুরু করতে পারতেন! কার্ডটি হাতে নিয়ে তা হলে ভোট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না।

অবশ্য ভোট এলে চাকরির লোভ দেখানো বেকারত্বে জর্জরিত ভারতে খুব সহজ এবং পরিচিত ঘটনা। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়া মাত্র চাকরির প্রতিশ্রুতির যেন বান ডেকে যায়। বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে বসার আগে ২০১৪ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থাকার সময়ও কম কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি শোনায়নি। একবার হলদিয়া পেট্রোকেম প্রকল্পে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থানের গল্প শুনিয়ে শেষে সর্বসাকুল্যে তা দাঁড়িয়েছিল ৯০০ তে। সিঙ্গুরের লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের হিসাব চাইতে টাটা কোম্পানির সিইও বলে ফেলেছিলেন, ন্যানো কারখানায় খুব জোর শ'তিনেক লোকের কাজ হতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেস তো গত বিধানসভা ভোটের আগে একেবারে 'এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক'ই খুলে ফেলেছিল। যে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নাম লিখিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী বছরের পর বছর বসে আছেন, চাকরির দেখা নেই। চাকরি বলতে তারা দিয়েছে কিছু সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি। যার না আছে স্থায়িত্ব না উপযুক্ত বেতন। বিহারের সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটের আগে লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বী যাদব ১০ লক্ষ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতেই বিজেপির জোটসঙ্গী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলে ফেললেন, আমি ১৫ বছর মুখ্যমন্ত্রীত্বে খুব বেশি হলে ৬ লক্ষ চাকরি দিতে পেরেছি। বিজেপি দেখল, ঝুলির বেড়াল বেরিয়ে পড়ছে! তাই জোর গলায় প্রচার শুরু করল— তেজস্বী ১০ লক্ষ চাকরি দিলে আমরা দেব ১৯ লক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিদেশ থেকে কালো টাকা ধরে এনে সব ভারতবাসীর অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা ভরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা দেশবাসীর মনে গেঁথে গেছে। কিন্তু আরও দৃঢ় হয়ে গেঁথে গেছে তাঁর অন্যতম সুহৃদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রধান মুখ অমিত শাহের এ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাটি। অমিত শাহ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এগুলো সব ভোটের বাজারে বলা হাওয়ায় ভাসানো কথা। তাঁর ভাষায়— স্রেফ 'জুমলা'।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া চাকরির প্রতিশ্রুতির কী হাল হয়েছে? ২০১৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) জানাচ্ছে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রথম চার বছরে কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৮ লক্ষ ২৩ হাজার। ভুলে যাবেন না, এটা সারা ভারতের হিসাব। ফলে তথাকথিত সিভিক ভলান্টিয়ার, সামান্য ভাতা পাওয়া আশাকর্মী, স্কুল কলেজের ২/৩ হাজার টাকার পার্শ্বশিক্ষক, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ ইত্যাদি সব হিসাব ধরা আছে। আর পরের দফায়? ২০১৯ সালের সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন (এনএসএসও) বলেছিল ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বেকারির হার উপহার দিয়েছে বিজেপির বিকাশ পুরুষ নরেন্দ্র মোদী জমানা। ২০১৯-এর ভোটের আগে সেই তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এনএসএসও প্রধানকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮-র সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বরে আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর সাসটেইনেবল এমপ্লয়মেন্ট' এবং সিএমআইই-র সমীক্ষা জানিয়েছিল, ওই বছর কমপক্ষে ১ কোটি ১১ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছিলেন।

২০২০-র এপ্রিল থেকে জুন মাসে সরকারি হিসাবেই ১২ কোটি ২০ লক্ষের বেশি মানুষ নতুন করে কাজ হারিয়েছেন। বিজেপি শাসিত ঝাড়খণ্ডে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। বিজেপি জোটের সোনার রাজত্বে বিহারে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশের উপরে। হরিয়ানার মতো শিল্প এবং কৃষিতে উন্নত রাজ্যেও বেকারত্ব ৯ শতাংশর উপরে (টাইমস নিউজ নেটওয়ার্ক, ২ জুন ২০২০ এবং সিইআইসিডাটা.কম)। সরকার বলতে পারে আপাতত করোনা পরিস্থিতির জন্য অনেক কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি কাটলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কোন জাদুবলে তা হবে! করোনার আগে পরিস্থিতি কী ছিল? প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, দেশে চাকরির অভাব নেই, কিন্তু সঠিক তথ্যের অভাবেই যুবকরা সেই চাকরির সন্ধান পায় না। কত কাজ আছে? সেন্টার ফর ইকনমিক ইনফরমেশন অ্যান্ড সেন্সাস (সিইআইসি) সরকারি তথ্য দিয়ে দেখাচ্ছে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ভারতে কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী) প্রায় ৭৭ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৮.৫ কোটি কিছু কাজ পেয়েছেন, বাকিরা কর্মহীন। এরা কি তথ্যের অভাবে কাজ পাচ্ছে না? তাহলে তথ্যই দেখা যাক। আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থাগুলি দেখিয়েছে ভারতে ২০১৯ সালে নতুন চাকরি তৈরি হয়েছে আগের বছরের তুলনায় মাত্র ২.৮ শতাংশ। কোর ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ঋণাত্মক হারে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ চাকরি হয়নি, বদলে ছাঁটাই হয়েছে বেশি। রেল, বিএসএনএল, তেল কোম্পানি, সরকারি দপ্তরে নতুন নিয়োগ বন্ধ। লক্ষ লক্ষ কর্মচারীকে সরাসরি ছাঁটাই করা হচ্ছে। ইস্পাত, খনি, সার, সিমেন্ট শিল্পে চলছে ছাঁটাই (ইকনমিক টাইমস, ১৯.১১.২০১৯)। সরকার বেকারত্বের হিসাবে অনেক কারিকুরি করে। মূলত নথিভুক্ত বেকারদের যত শতাংশ কাজ পেল না, সেই সংখ্যাটাকেই দেখানো হয় বেকার হিসাবে। বাস্তবে যে কোটি কোটি মানুষ সামান্য মজুরিতেও যে কোনও একটা কাজের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের কোনও হিসাব সরকারের খাতায় নেই।

বিজেপি শাসিত রাজ্যেই বেকারত্ব সর্বোচ্চ

বিজেপি একক ভাবে বা কোনও শরিকের সঙ্গে জোট করে সরকারে থেকে যে সব 'সোনার রাজ্য' গড়েছে— সেগুলি বেকারত্বের হারে দেশে 'ফার্স্ট' হওয়ার তকমা পেয়েছে। ২০১৯ সালের শেষে যে ১০টি রাজ্যে বেকারির হার সর্বোচ্চ ছিল তার মধ্যে ৬টি বিজেপি 'সোনার শাসনে'-র তত্ত্বাবধানে ছিল। ওই সময় সরকারি হিসাবে বেকারির জাতীয় হার ছিল ৭.২ শতাংশ। সেই সময় সিএমআইই- তথ্য অনুযায়ী বেকারত্বের হারে সর্বোচ্চ ত্রিপুরা ৩১.২ শতাংশ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিল্লি ও হরিয়ানায় বেকার যথাক্রমে ২০.৪ এবং ২০.৩ শতাংশ। হিমাচলপ্রদেশ ১৫.৬, পাঞ্জাব ১১.৮, ঝাড়খণ্ড ১০.৯, বিহার ১০.৩, ছত্তিশগড় ৮.৬ এবং উত্তরপ্রদেশ ৮.২ শতাংশ। গুজরাটে যেখানে প্রায় ২০ বছর ধরে একটানা ক্ষমতায় আছে বিজেপি, সেখানে কী পরিস্থিতি? গুজরাটে বেকারত্বের হার গত জুন মাসে ছিল ১৩.৬ শতাংশ। ২০১৯-এর নভেম্বরেও তা ছিল জাতীয় গড়ের থেকে বেশি (দ্য মিন্ট, ১.০৬.২০)। এই হিসাব যদিও বেকারত্বের আসল চেহারাটা দেখায় না। সরকারের শ্রম দপ্তর দেখাচ্ছে, ২০১৯ সালে দেশে জনসংখ্যা বাড়লেও কর্মরত মানুষের সংখ্যা কমেছে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। কর্মক্ষম মানুষের কাজের বাজারে আসার হারই (লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট) কমেছে ১০ শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ কাজ চাইবার মতো সুযোগও মানুষ পাচ্ছে না (বিজনেসটুডে.ইন, ৮.১০.২০১৯)।

সারা দেশে শিল্পে সংকট, চাকরি কোথায় হবে?

ভারতে গত ছ'মাসে জিডিপি-র (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) সংকোচন ঘটেছে। প্রথম তিন মাসে সংকোচনের পরিমাণ ছিল ২৪ শতাংশ। সরকারের স্বীকারোক্তিই বলছে দেশ মন্দার কবলে। শিল্প, খনি, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট-ব্রিজ ইত্যাদি পরিকাঠামো নির্মাণ শিল্পে প্রায় কোনও নতুন কাজ নেই। উৎপাদন বাড়া দূরে থাক তা ক্রমাগত কমছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে যারা বলে— 'আমরা এলেই চাকরি দিয়ে দেব' তাদের থেকে বড় মিথ্যাবাদী কেউ আছে? কান পাতলেই শোনা যায় একটা প্রচার— গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বিজেপি সুকৌশলে দেখায় শুধু তারা ক্ষমতায় নেই বলেই বাংলার এই হাল! গুজরাটের বেকার সমস্যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা দেখলেই বোঝা যায় কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে কতই না শিল্পায়ন ঘটিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী! আজও একদল ধুরন্ধর সিঙ্গুরের শিল্পায়ন সম্ভাবনা নিয়ে কতই না কুম্ভীরাশ্রু ফেলেন! যে সময় সিঙ্গুর থেকে টাটাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী, তার ৫ বছর পরেও গুজরাটের বেশিরভাগ শ্রমিক অস্থায়ী হয়েই থেকেছেন।

গুজরাটে কর্পোরেটেরা বড় বড় কারখানা, বন্দর তৈরি করেছে, কিন্তু তাতে সাধারণ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে কোথায়? যত গড় আয়ের বৃদ্ধি দেখিয়েছে সরকার, তত সাধারণ শ্রমিকের মজুরির হার কমেছে। সে রাজ্যের মাত্র ৩.১ শতাংশ শ্রমিক মাসে ২৫ দিন কাজ পেয়ে ৫ জনের সংসার চালানোর মতো ন্যূনতম রোজগার করতে পারেন (দ্য ওয়্যার,২৭.১১.২০১৭)। অর্থাৎ ৯৭ শতাংশ শ্রমিকেরই সংসার চালানোর মতো রোজগার নেই। আজ পরিস্থিতি আরও সংকটময়। এই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে চাকরির বান ডাকিয়ে দেবে? মিথ্যাচারই কি বিজেপি কথিত 'সোনার বাংলা'র ভিত্তি?

রাজ্যপালকে ডেপুটেশন এআইএমএসএস-এর

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২১ ডিসেম্বর এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেন। রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রুনা পুরকাইত, স্বপ্না দাশগুপ্ত সহ ৮ জনের এক প্রতিনিধিদল এই স্মারকলিপি দিতে যান। রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁর অফিস এই স্মারকলিপি গ্রহণ করে। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২৫ হাজার গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় দু 'সপ্তাহ ধরে। এ ছাড়াও অন লাইনে সই সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মানুষ মারা কৃষি বিল সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী ২০২০ প্রত্যাহার, মদ নিষিদ্ধ করা ও নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে এই স্মারকলিপি। সম্পাদক জানান,আমরা রাজ্যপালকে বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছি। দিল্লিতে আমাদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা কৃষক আন্দোলনকারীদের পাশে রয়েছেন। আন্দোলন সফল করার জন্য আমাদের লড়াই চলবে।

“শত অত্যাচার মোকাবিলায় তৈরি চাষির এই শক্ত হাত”

‘যদি গুলি চালায় পুলিশ, তাহলে কী করবেন?’— দিল্লিতে কৃষকদের ধরনায় এক প্রবীণ কৃষককে প্রশ্ন করেছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসক ডাঃ মৃদুল সরকার। রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, খেতে কাজ করা, কড়া-পড়া মেহনতি হাত তুলে ধরে কৃষকের বলিষ্ঠ উত্তর, ‘কয়েক যুগ ধরে ট্রাক্টর চালাচ্ছি। এই হাত অবহেলা করার নয়। এই হাত দিয়েই এর মোকাবিলা করব।’

আন্দোলন মোকাবিলায় সরকারের হাতিয়ার যখন পুলিশ-মিলিটারি-জলকামান-টিয়ারগ্যাস-লোহার ব্যারিকেড-কয়েক মণ ওজনের ট্যাঙ্কার-কাঁটাতারের বেড়া কিংবা আইন সংশোধনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, একের পর এক ধাপ্পা, তখন খেতে-খামারে কাজ করা কৃষক-খেতমজুররা কৃষি আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়পণ করেছেন নিজেদের হাত দুটো সম্বল করে। হরিয়ানার সিংঘু বর্ডারে ১২ কিলোমিটার ধরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার ট্রাক্টরে আসা লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রতিনিধির এমনই দৃপ্ত ভঙ্গি তাই সারা দেশে জাগিয়েছে আন্দোলনের বান।

এই কৃষকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে ২ ডিসেম্বর থেকে সিংঘু বর্ডারে মেডিকেল ক্যাম্প শুরু করেছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (এমএসসি)। কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উদ্বোধন করেছেন ক্যাম্পের। সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে একটি দল কৃষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে দিল্লি ছুটে যান। তাতে যোগ দেন স্থানীয় ও আশপাশের রাজ্যগুলি থেকে আসা ওই সংগঠনের ডাক্তার-নার্সরা। ধর্ম-বর্ণ-ভাষার ব্যবধান হার মেনেছে মানবিকতার কাছে। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহচর্য আন্দোলনকারীদের মনোবল কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ৭২ বছরের এক বৃদ্ধা চিকিৎসা শিবিরে এসেছেন প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা বাড়ি ফিরে যেতে বললে এককথায় তা নস্যাৎ করে দেন। বলেন, ‘মরতে হয় এখানেই মরব। সরকার কৃষি আইন প্রত্যাহার করুক, না হলে এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না।’ এই দৃঢ়তা, এই প্রত্যয়, এই সংগ্রামী মনোবল অসংখ্য বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে। শুধু তিনিই নন, তাঁর মতো অনেক কৃষক-মজুরই এসেছেন হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, হার্ট, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি এবং চোখ ও ত্বকের নানা রোগ নিয়ে। দিল্লির কনকনে ঠাণ্ডায়, কুয়াশায়, দূষণযুক্ত পরিবেশে অসুস্থও হয়ে পড়ছেন অনেকেই। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশের জলকামান-টিয়ারগ্যাস আক্রমণে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইটে হাত-পা ভেঙেছে অনেকের। তা সত্ত্বেও লড়াইয়ের মাটি ছেড়ে যাবেন না তাঁরা। আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কাছে শারীরিক কষ্ট, রোগ সবই গৌণ হয়ে গেছে।

দিল্লির কৃষক ধরনায় অসুস্থদের চিকিৎসা করছেন এমএসসি ও এসডিএফ-এর সদস্যরা

এঁদের সকলের চিকিৎসা করছেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাক্তার-নার্সরা। ওষুধ ফুরিয়ে যাওয়ার পর অমৃতসর থেকে ইন্টার্নরা অনেক ওষুধপত্র সরবরাহ করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলছে স্বাস্থ্যশিবির। বহু ছাত্র-যুবক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এগিয়ে এসেছেন। ক্যাম্পে সাহায্য করতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সদস্যরাও। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলা এবং ধৈর্য সহকারে রোগীরা লাইনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র নিচ্ছেন। বয়স্কদের সাহায্য করছে ছোটরা। রোগী দেখতে দেখতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্দোলনের উত্তাপ অনুভব করছেন। এ এক নতুন আন্দোলন, যাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে কৃষক-খেতমজুর, আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী কৃষক নেতা থেকে আন্দোলনে প্রেরণা জোগানো প্রতিটি মানুষ। রাতে লঙরখানায় রুটি, ডাল, সবজি খেয়ে কৃষকদের সাথে তাঁবুতে ঘুমাতে যাচ্ছেন চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা পরের দিনের কর্তব্য পালনের তাগিদ নিয়ে। আবার কখনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রাতেও রোগী দেখার ডাক পড়ছে এঁদের, ছুটে যাচ্ছেন রোগী দেখতে।

ধরনা স্থলে ট্রাক্টরে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বসে কয়েকটি স্কুল ছাত্র স্লোগান দিচ্ছিল— ‘কৃষক একতা জিন্দাবাদ।’ স্কুল ছেড়ে এখানে কেন? প্রশ্ন করায় চটজলদি উত্তর ‘আমরা সেবা করতে এসেছি।’ অমৃতসর থেকে আসা ওই ছাত্রের মা-র কাছে জানতে চাওয়া হল এই ভয়ানক ঠাণ্ডায়, পুলিশি হামলার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কেন এনেছেন ওদের? তৎক্ষণাৎ বললেন, ‘এরা ছোট থেকেই জানুক, বুঝুক সবকিছু। তাহলেই বড় হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখবে।’ এই না হলে ভগৎ সিং-এর মাটি! ফাঁসির আগে জেলে লোহার গরাদের বাইরে থেকে ভগৎ সিং-এর মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেছিলেন, ভগনওয়ালা, কিছুতেই আদর্শ বিসর্জন দিও না। তুমি এমনভাবে জীবন বিসর্জন দেবে যা দেখে ঘরে ঘরে মায়েরা প্রার্থনা করবে তাদের সন্তান যেন ভগৎ সিং-এর মতো হয়। আজকের এই মায়েরা তো বাস্তবে তাঁদেরই উত্তরসূরি। ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রায় ঘরেই যখন বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন রাজধানীর মানুষ, তখন ধরনাস্থলে আসা বহু জনই ট্রাকের নিচে, না হয় খোলা আকাশের নিচে কম্বলে জড়াজড়ি করে কোনওরকমে রাত কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ২২ জন শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন ঠাণ্ডায় ও দুর্ঘটনায়। এই হার না মানা আন্দোলনে আদর্শ কে? উত্তর আসছে ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা খান। তাই সরকার যতই বিভ্রান্তি ছড়াক, ভয় দেখাক— সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে জীবনপণ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন নানা রাজ্য থেকে আসা কৃষিজীবী মানুষ ও তাদের পরিজনরা। মহিলা থেকে শিশু, যুবক থেকে প্রবীণ সকলেই এই প্রত্যয় নিয়ে ধর্নায় রয়েছেন— হয় দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করব, না হয় এখানেই মরব।

সংবাদপত্রের পাতায়

কৃষক আন্দোলনের ধাক্কায় এনডিএ শিবিরে ফাটল

- পাঞ্জাবের কৃষক নেতারা সরকারিভাবেই বিজেপি নেতাদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।
- হরিয়ানাতেও বিজেপি শরিক জেজেপি নেতৃত্বের উপর জোট ত্যাগ করার চাপ বাড়ছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩-১২-২০২০)
- রাজস্থানের লোকতান্ত্রিক পার্টির নেতা হনুমান বেনিওয়াল তিনটি সংসদীয় কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়ে জানিয়েছিলেন আগামী সপ্তাহেই তাঁরা এনডিএ ত্যাগ করতে পারেন।
- পুরনো শরিক অকালি দলের পর বেনিওয়াল সরলে এনডিএর দলের সংখ্যা আরও কমবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২০-১২-২০২০)

কৃষি আইন পাশ হতেই ধানের দাম অর্ধেক হয়ে গেল

“কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী যে রাজ্যের কৃষকদের সামনে এসব কথা বললেন, সেই মধ্যপ্রদেশেই তিন কৃষি আইনের অধ্যাদেশ জারির পরে ২৬৯টি মাণ্ডির মধ্যে ৪৭টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ ডিসেম্বর) মধ্যপ্রদেশের বহু মাণ্ডিতে কৃষকরা এমএসপির থেকে অনেক কম, ১২০০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন, যেখানে কিছুদিন আগেও ২২০০ টাকা দরে ধান বিক্রি হয়েছে।”

(আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯-১২-২০২০)

দিল্লির টিকরি সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের মঞ্চে ডিএসও, ডিওয়াই, এমএসএস-এর উদ্যোগে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার শহিদ-স্মরণ অনুষ্ঠান। ১৯ ডিসেম্বর

কৃষক আন্দোলনের শহিদ স্মরণ

নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর

দিঘিতোলা গ্রাম, পুরুলিয়া

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কৃষক অবস্থান

১২ থেকে ১৭ ডিসেম্বর রায়দিঘির গোলপার্কে কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ধরনা হয়েছে। প্রতিদিন বিভিন্ন গণসংগঠন, ফোরাম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অবস্থানরত কৃষকদের এবং দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছেন। বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটি, সাধারণ মানুষ মঞ্চে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এই ধরনা রায়দিঘি এলাকায় বেশ প্রভাব ফেলেছে। দোকানদার, হকার ও সাধারণ মানুষ মঞ্চের অবস্থানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। শেষ দিনে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর।

রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অ্যাবেকা, গ্রামীণ ডাক্তারদের সংগঠন পিএমপিএআই, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বহু জয়নগর ২নং ব্লকের প্রিয়র মোড়, জয়নগর ১নং ব্লকের ঢোসা হাট, ক্যানিং মহকুমার ভোজের হাটে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপুরে ধরনা মঞ্চে কৃষক আন্দোলনে সংহতি

১৬ ডিসেম্বর দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে ধরনা অবস্থান করে কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করল স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উপস্থিত ছিলেন গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির সদস্যবৃন্দ, বক্তব্য রাখেন কমিটির সদস্য সবরজিৎ সিং। এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্যরা ধর্নায় সামিল হন, বক্তব্য রাখেন জনাব আমাউদ্দিন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন শোভন দাস, সৌমেন কীর্তনীয়া, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে অধ্যাপিকা পলি চ্যাটার্জী আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে মর্মস্পর্শী বক্তব্য তুলে ধরেন।

এছাড়াও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, গার্জেনস ফোরাম, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য সহ দুর্গাপুরের আবৃত্তিকার, সঙ্গীতশিল্পীরা তাঁদের পরিবেশনার মাধ্যমে সংহতি মঞ্চকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

মিড ডে মিল কর্মীদের আন্দোলন

মিড ডে মিল কর্মীরা মারাত্মক বঞ্চনার শিকার। খাবার রান্না, পরিবেশন ও বাসন ধোয়া সহ সব কাজই করতে হয়। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তাঁরা মাসে মাত্র ১৫০০ টাকা পান। বছরে ১২ মাস নয়, মাত্র ১০ মাস তাঁরা এই টাকা পান। কোনও প্রকার সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না। 'সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন' বহু বার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে মিড ডে মিল কর্মীদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। কিন্তু সরকার নির্বিকার। কোনও ফল হয়নি। এই কর্মীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পরিবার থেকে আসা মহিলা। বেশিরভাগ পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিক। করোনা পরিস্থিতিতে তারাও কর্মহীন।

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে মিড-ডে-মিল কর্মীরা ১৯ ডিসেম্বর হুগলির জাঙ্গিপাড়া ব্লকে মামুদপুর অন্নদাপ্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সভায় যোগ দেন। সভায় বক্তব্য রাখেন মিড ডে মিল ইউনিয়নের সংগঠক অঞ্জু কোলে ও রীনা বক্সী। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সংগঠক নিখিল বেরা। সভা থেকে সুবর্ণা ঘোষালকে সভানেত্রী, অঞ্জু কোলেকে সম্পাদিকা ও অনিতা কাঁড়ালকে কোষাধ্যক্ষ করে মিড ডে মিল কর্মীদের আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারি রাজভবন অভিযান সফল করার জন্য জন্য সকলকে আবেদন জানানো হয়।

পাঞ্জাবে এআইকেকেএমএস-এর কমিটি গঠিত

কৃষক স্বার্থ-বিরোধী কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকরা যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাকে শক্তিশালী করতে সংগ্রামী কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছে। আন্দোলনে সংগঠনের এই আন্তরিক ভূমিকা পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলেছে। এরই ভিত্তিতে পাঞ্জাবের কৃষকদের সাথে সংগঠনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং সেখানকার কৃষকদের সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে ২০ ডিসেম্বর সংগঠনের প্রস্তুতি কমিটি গড়ে উঠেছে। কমিটি গঠনে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির কৃষক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, সংগঠনের সভাপতি কমরেড সত্যবান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ ও পাঞ্জাবে পার্টির সম্পাদক কমরেড অমিন্দর পাল সিং।

আন্দোলনের ফলে আদ্রা ডিভিশনে রেল চালু

লকডাউনের পর রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে ট্রেন চালু হলেও আদ্রা ডিভিশনে কোনও ট্রেন চালু করেনি রেলদপ্তর। এর প্রতিবাদে দীর্ঘ একমাস ধরে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্টেশনে বিক্ষোভ ডেপুটেশন চলতে থাকে। আন্দোলনের চাপে অবশেষে কিছু ট্রেন চালাতে বাধ্য হয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি লোকাল ট্রেনকে মেল বা এক্সপ্রেস করে দেওয়ায় যাত্রীদের সমস্যা থেকেই যায়। পুরুলিয়া-আদ্রা কোনও ট্রেন চালু না হওয়ায় জনগণের সমস্যা আরও বাড়তে থাকে। অবিলম্বে পুরুলিয়া-আদ্রা লোকাল ট্রেন চালানো, হাওড়া-চক্রধরপুর ট্রেনের স্টপেজ সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৭ ডিসেম্বর বাগালিয়া স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে আদ্রা ডিআরএমকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবশেষে ডিআরএম লোকাল ট্রেন চালানোর সার্কুলার জারি করেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ আনাড়া শাখার সদস্য ভূতনাথ মাহাত।

রায়গঞ্জে কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন

জীবন-জীবিকা ও শিক্ষার অধিকারের দাবিতে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতার সমস্যা নিয়ে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে চেম্বার অব কমার্স হলে এআইডিএসও-র একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিল্লির কৃষক আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে এক সুসজ্জিত মিছিল রায়গঞ্জের গীতাঞ্জলি সিনেমা হল থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত গিয়ে কৃষি আইনের একটি প্রতিলিপি পোড়ায়। প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সামসুল আলম, উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত, জেলা সভাপতি কমরেড হারুন রশিদ ও অন্যান্যরা।

মালদায় কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সভা

এ আই কে কে এম এস, মালদা জেলার উদ্যোগে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে গাজোল বিদ্রোহী মোড়ে কৃষক অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় ১৪ ডিসেম্বর। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড সুভাষ সরকার, কৃষক নেতা কমরেড সুপেন রায়, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মালদা জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার। গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করা ও তাদের আন্দোলনে যুক্ত করা, ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করার আবেদন জানান তিনি। সভার সভাপতি কমরেড অংশুধর মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে এই আইন কী ভাবে কর্পোরেটদের সেবা করছে তা দেখান। তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com